দানাপানি

দুপুর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সূয্যিদেবের রক্তচক্ষু কটমট করে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে ঝিমিয়ে এসেছে ক্রমে। পাখ-পাখালি, মানুষজন শান্ত শীতল কুলায় বৃক্ষচ্ছায়ে গৃহাভ্যন্তরে মধ্যদিনের বিশ্রামে নিমগ্ন। ক্লান্তি নেই বুঝি শুধু বলরামের। সকালে একখানা বাসি রুটি খেয়ে সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, পেটে আর একটি দানাও পড়েনি তারপর। অথচ বাড়ি তার খুব একটা দূর নয়, আর এমন কিছু মারাত্মক রকমের জরুরী কাজে রত নেই সে। বনবাদাড় ঘুরে কাঠকুটো যা জড়ো করেছে সেগুলো এক্ষুণি দরকার ছিল না। অন্তত আজকের রান্নার জন্যে তার আনা জ্বালানি কাঠের প্রত্যাশায় বসে নেই কেউ।

সকালে উঠেই ওর বউ সুরতিয়া শাশুড়ির নির্দেশমত ঠেকুয়া ভাজার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে। আটা গুড় মৌরি ডালডা নারকোল। কাল বিকেলে বলরামের বাপ নিজে গিয়ে হাট থেকে কিনে এনেছে সব। ছাতু রশুন কাঁচালঙ্কাও এসেছে। বলরামের মা উঠোনে ঘুঁটের আগুনে ছাতুর পুর ভরা মোটা মোটা লিট্টি সেঁকবে। সেই লিট্টি ক্ষেতের কচি বেগুনপোড়া দিয়ে খাবে সবাই। আর শেষ পাতে খাবে ঠেকুয়া। বলরামের পেট আর মন মোচড় দিয়ে উঠলো। সদ্য ভাজা, সদ্য স্যাঁকা ভোজ্য বস্তুর সুঘ্রাণ, সুখস্পর্শ, সুস্বাদ যেন এখানেও ধাওয়া করে আসছে তাকে।

রোজদিন লিট্টি-ঠেকুয়া খাবার মত ঘরের ছেলে নয় বলরাম। দু'বেলা ভরপেট রুটি কিংবা ভাত, কিংবা ছোলার ছাতু - তার সঙ্গে বড় জোর ক'টা কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ কুচি, এটুকু পেলেই ভাগ্য মানে তারা। ঠেকুয়া ভাজার উপলক্ষ ঘটেছে ঠিক এক বছর পর। নেহাৎ তার মামা নটবর গাঁয়ে এসেছে তাই। নটবর গাঁয়ে থাকে না। বেনারসে চাকরি করে। বছরে একবার দিন পনেরোর ছুটি কাটিয়ে যায় শুধু। বউ ছেলেপুলে আত্মীয় স্বজন সবার জন্যে দেদার জিনিসপত্র আনে, আত্মীয়

মহলে তাই তার খাতিরও অঢেল। বলরামের পরিবারে আরও বিশেষ খাতির এই জন্যে যে শুধু নটবরের কৃপাতেই তারা আজও টিকে আছে। তার বুড়ো বাপ বনোয়ারীকে দেখে আজ আর কারো বুঝবার উপায় নেই যৌবনে কি নিদারুণ উচ্ছৃঙ্খল ছিল লোকটা। ইয়া বিরাট লম্বা চওড়া শক্তিশালী মানুষ - সদাচঞ্চল মনটা তার মৌমাছির মত নিত্য নতুন ফুলের খোঁজে ঘুরতো। বলরামের ভালমানুষ মা শনিচরীর সাধ্যি ছিল না মানুষটাকে বলগা টেনে কাবুতে রাখে। সে বেচারী এমনিতেই নিস্তেজ তার উপর অপরিমিত সন্তানোৎপাদনে তার সামান্য জীবনীশক্তিটুকুও ক্ষয়ে আসছিল।

স্বামীকে পারতপক্ষে ঘাঁটাতো না শনিচরী, স্বামী তার রাতের পর রাত পর-সঙ্গ করে আসছে জেনেও। শুধু প্রেয়সীদের ভেট দেবার জন্যে বনোয়ারী যখন বৌয়ের গা থেকে তার বাপের দেওয়া রূপোর ভারি গয়নাগুলো খুলে নিয়ে যেতো তখনই শুধু ক্ষীণ কন্ঠে খানিক কান্নাকাটি শুনতো পাড়াপ্রতিবেশীরা। বনোয়ারীর হুমকি ও গর্জনে তাও থেমে যেতো অচিরেই। শনিচরীর বাপের বাড়ি এই গাঁয়েই। বাপ তার বিয়ে দিয়েই চোখ বুঁজেছে। মা মরেছে আরও দু'বছর পরে। থাকার মধ্যে শুধু ভাই নটবর। তারই মুখ চেয়ে দিন কেটেছে শনিচরীর। নইলে বনোয়ারী কোনদিন চেয়েও দেখেনি বউ আর তার কচি বাচ্চাগুলোর খাবার জুটছে কিনা, পরনের কাপড় আছে কি নেই। নটবর যখন যা জোটাতে পেরেছে অক্লেশে দিদির সংসারে দিয়ে এসেছে বরাবর। ইতিমধ্যে বনোয়ারী বহু কীর্তিকলাপ করে চরম দেখালো গাঁয়ের ভগলু কাঁহারের বজ্জাত বউটাকে নিয়ে কেটে পড়ে।

বছর দুই নিরুদ্দেশ থেকে বনোয়ারী যখন ফিরে এলো তখন একেবারে অন্য মানুষ সে। ভগলুর পাজী বউটাই নাকি তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে। এমন ঘোল খাইয়েছে বনোয়ারীকে যে তার বনোয়ারীত্ব ঘুচে গেছে জন্মের মত। মাগীর চক্রান্তে ছ'মাস জেলের ঘানি টেনে লজ্জায় দুঃখে অনুশোচনায় পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে ফিরে এসেছে। শনিচরীর পায়ে মাথা কুটে রক্ত বার করে দিয়েছে, আটটি সন্তানের প্রত্যেককে জনে জনে বুকে নিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছে। শ্যালক নটবরের সামনে গলবস্ত্র হয়ে বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করেছে যৌবনের তাবৎ কৃতকর্মের জন্যে। বলরামের বয়স তখন বছর দশেক। ভাসা ভাসা মনে আছে তার।

নটবর এ ঘটনার বছর দুয়েক আগে বিয়ে করেছে। বউ যখন আসন্নপ্রসবা, বউকে দিদির হেফাজতে রেখে নটবর বেনারসে চাকরি করতে গেল। বছর দশেক কেটে গেছে তারপর। প্রতিবছর একবার গাঁয়ে আসে নটবর, রাশিকৃত উপহার নিয়ে। জামাকাপড়, খাবার-দাবার, টুকিটাকি। নটবরের ফ্যাকাসে ডিগডিগে বউ, যে গত দশ বছরে আধডজন খানেক সন্তানের জন্ম দিয়ে আরও ফ্যাকাসে আর ডিগডিগে হয়েছে, নতুন ছাপা শাড়ি আর হাতভর্তি রেশমী চুড়ি পরে ট্যাশ্‌ল্‌ দিয়ে লম্বা বিনুনি ঝুলিয়ে হেলেদুলে ঘুরে বেড়ায় স্বামী সোহাগিনী হয়ে। তারপর স্বামীর প্রবাস যাত্রার অল্পদিন পরেই চারপাইয়ে পড়ে হোয়াক হোয়াক বমি করে আর আরেক দফা আঁতুর প্রবেশের প্রস্তুতি শুরু হয়।

এ বছরেও সেই বার্ষিক ছুটি কাটাতেই এসেছিল নটবর। বলরাম ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে তার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। বেনারস থেকে আনা ডোরাকাটা পাজামা আর মস্তান রঙের বেনিয়ান জোড়া হাতে নিয়ে সস্নেহে হাত বোলাচ্ছে এমন সময় সেই নিদারুণ খবরটা কানে এলো তার। নটবর নাকি এবার আর একা ফিরছে না, ভাগ্নে বলরামকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে। বেনারসে সে যে ছাঁটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে সেখানে বলরামকেও চাকরি পাইয়ে দেবে। তার চাকরি পাকা করেই এসেছে, শুধু তার গিয়ে দাঁড়ানোর অপেক্ষা। বলরামের দু'চোখে আঁধার ঘনিয়ে এলো এ কথায়। বাপের মত উড়ুক্কু মন পায়নি সে। দেশে গাঁয়ে নিজেদের ঘরে সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে আছে। শুকনো বাসি রুটি, পেঁয়াজ লঙ্কা ঘষে ছোলার ছাতু খেয়ে সাদাসিধে শ্যামলারঙের বউকে নিয়ে এখানেই জীবন কাটাতে চায় সে। শহরের কাঁচা পয়সার লোভ তার নেই।

কিন্তু কে শুনছে তার কথা। বাপ মা তো নটবরের কথা শোনা অবধি উৎসাহে লাফাচ্ছে। এখন থেকেই নানারকম খোয়াব দেখছে সাংসারিক সচ্ছলতার। এমনকি বউ সুরতিয়াও এতটুকু অসন্তোষের রেশও প্রকাশ করেনি এ খবরে। সেও শেষ পর্যন্ত মামীশাশুড়ির ছাপা শাড়ি, রেশমী চুড়ি আর লম্বা ট্যাশ্‌ল্‌ দেখে ভুলেছে। সাধে কি আর ছাঁকা ঘিয়ে ভাজা ঠেকুয়া আর সোঁদাগন্ধ লিট্‌টির মোহ ছেড়ে ভর-দুপুরের রোদ মাথায় করে বনে বাদাড়ে জ্বালানি কাঠের অজুহাতে খ্যাপার মত ঘুরে বেড়িয়েছে

বলরাম!

বলরাম কাঠের বোঝা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুতির খুঁটে কপাল মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মুছতে লাগলো। নটবরকে ঘিরে শনিচরী আর বনোয়ারী উবু হয়ে বসে একমনে তার বাক্যসুধা পান করছে উদগ্রীব হৃদয়ে। নটবরের বউ সেজেগুজে পটের বিবি হয়ে ঘোমটার আড়াল থেকে হাসি হাসি মুখে চেয়ে রয়েছে। একগলা ঘোমটা টেনে সুরতিয়াও ঘরের অন্যপ্রান্তে বসে কি এক কাজের অছিলায় উন্মুখ হয়ে কথা শুনছে।

বলরামকে দেখে শনিচরী বললো, "এত দেরী করলি! কখন খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে আমাদের।"

বনোয়ারী রাগত গলায় বললো, "জানিস মামা এসেছে, খাওয়া দাওয়া আছে বাড়িতে। আজ এই কাঠের বোঝা না আনলে চলতো না তোর?"

মামী ঘোমটার আড়াল থেকে মৃদুস্বরে স্বামীকে কিছু বললো।

নটবর হো হো করে হেসে উঠলো, "শুনেছিস তোর মামীর কথা? বউ ছেড়ে যেতে নাকি তোর মন সরছে না। মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস তাই। আরে দূর! বউকে তো লটকে দিয়েছিস, এখন আর এখানে থেকে কি করবি? আঁতুর তুলবি নাকি?"

সুরতিয়া দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। নটবর দুলে দুলে হাসতে লাগলো।

শনিচরী বললো, "ঠিকই বলেছে ও। এমন ঘরকুনো হয়েছে ছেলেটা!"

বনোয়ারী বলে, "মরদ না তুই! বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকলে চলবে?"

বলরামের গলা বুঁজে আসে মূক অভিমানে। বাপের পৌরুষদৃপ্ত দিনগুলো ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আজ মাও কি না

তাকে ঘরকুনো বলে খোঁটা দিচ্ছে!

নটবর হাসি থামিয়ে বলে, "আয় বোস। খেয়ে নে। কাল বেলা বারোটায় ট্রেন। ভোর রাত্রে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

ভোর রাত্রে যাত্রা করতে হবে। সন্ধ্যের পরেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লো বলরাম নটবরের নির্দেশ মত। সংসারের কাজ পাট চুকিয়ে সুরতিয়া যখন শুতে এলো তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। স্বামীর পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বোলাতে লাগলো ধীরে ধীরে। বলরাম ঘুমোয়নি। চোখ বুঁজে পড়ে পড়ে রাজ্যের চিন্তা করছিল মনে মনে। সুরতিয়ার উপর বড় অভিমান হয়েছিল তার। এক কথায় কোন বিদেশবিভূঁয়ে ঠেলে দিচ্ছে তাকে। সে যে সেখানে গিয়ে কেমন থাকবে কি করে থাকবে সে সব চিন্তা দূরে থাক, বলরাম যে সুরতিয়ার কাছে একবছরের আগে আসতে পাবে না তাতে এতটুকুও দুঃখ নেই সুরতিয়ার মনে। ঠিক আছে, তবে তাই হোক। বলরাম চলে যাবে। বউয়ের জন্য পয়সা কামাতে বউকে ছেড়ে যাবে। বউয়ের কাছে তার থেকে পয়সাই বেশী কাম্য যখন।

সুরতিয়া সরে এসে বলরামের বুকে মাথা রাখে। এরপর আর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতে পারে না বলরাম। কি হবে অভিমান করে? আজকের রাতটুকুই তো। বলরাম বউকে বুকে চেপে ধরে বছরের শোধ আদর করে নেয়।

অন্ধকার থাকতে থাকতে দুর্গা দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ে দু'জনে। ক্রোশ দুই পথ হাঁটতে হবে মাঠ ঘাট খানা ডোবা পেরিয়ে। পথ চলতে চলতে নটবর বলরামকে নানাবিধ উপদেশ নির্দেশ দিতে লাগলো, জীবনের চলার পথে কাজে লাগবে যা সব।

বললো, "দেখ, এত অল্পে মন খারাপ করতে নেই। সব সময় মনে রাখবি যে তুই মরদ। ভগবান স্ত্রী পুরুষের কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। সংসার, সতীত্ব এসব আওরতের জন্যে। মরদকে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। সারা পরিবারটার দানাপানি জোগানোর ভার তার। যতক্ষণ দানাপানি জোটাতে পাচ্ছো ততক্ষণ তোমার সাত খুন মাফ। অন্য যত দোষেই দোষী হও না কেন আসল পরীক্ষায় তুমি উতরে গেলে। কিন্তু এই আসল কাজটাই যদি না পারলে তবে দুনিয়া কেন তেমার নিজের পরিবারই তোমার গায়ে থুতু দেবে তা তুমি যতই নিষ্কলঙ্ক ভাল মানুষ

হও বা তাদের যতই ভালবাসো না কেন।"

আবার বলে, "আমিও তোর বয়সেই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। ঘরে আমারও তখন পোয়াতি বউ। আমারই কি কম কষ্ট হয়েছিল তাকে ছেড়ে আসতে? কিন্তু বউয়ের টানে সেদিন যদি ঘরে বসে থাকতাম আজ সেই বউই আমায় উঠতে বসতে খোঁটা দিতো। আর এখন দেখছিস তো?"

তা বলরাম দেখেছে। দশ বছর আগের নটবর আর আজকের নটবরে জমীন আসমান ফারাক। সেদিনকার সেই মুখচোরা ভীতু ছেলেটা আপ্রাণ খেটে পাওয়া পয়সাগুলো নিঃশব্দে দুঃখিনী দিদির হাতে তুলে দিয়ে সমবেদনায় ম্লান হয়ে থাকতো। দিদি-ভগ্নিপতির সামনে মুরুব্বির মত বসে বসে কেচ্ছা-মস্করা আর দুলে দুলে অট্টহাসি, এসব কল্পনাও করতে পারতো না সে।

নটবর বলে চলে, "সব সময় মনে রাখবি দেশ গাঁয়ের দুনিয়া আর শহর প্রবাসের দুনিয়া দুটো এক নয়। ওখানে যা খাটে তা এখানে খাটে না আবার এখানে যা চলে তা অনেক সময় ওখানে অচল। এ দুটো আলাদা রাখতে পারলে আরামে থাকবি, কিন্তু গুলিয়ে ফেললেই বিপদ।"

বেনারস স্টেশনে নেমে শেয়ারে টাঙ্গা নিলো ওরা আরও কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে। এ পথ সে পথ ঘুরে একটা এঁদো গলির মুখে এসে থামলো টাঙ্গাটা।

পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে রাস্তায় নেমে টাঙ্গাওয়ালার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে নটবর বললো, "ব্যস, এসে গেছিস। ঐ যে হলদে বাড়িটা, ওখানেই আমাদের বাসা। হ্যাঁ, যা বলেছিলাম ভুলবি না। দু'টো একেবারে আলাদা দুনিয়া বুঝলি? খবরদার গুলিয়ে ফেলিস না যেন।"

মামার উপদেশের তাৎপর্য তখন বুঝতে পারে না বলরাম। বোঝে খানিক পরে। হলদে বাড়িতে পদার্পণ করার পর।

বাড়ির একতলায় ক্ষুদে দুখানা ঘর। দরজার কড়া নাড়তেই ঘরের মধ্যে কটি শিশুকন্ঠ কলরব করে উঠলো। মোটাসোটা একজন বৌমানুষ

এসে দরজা খুলে দিলো।

নটবর তার গা ঘেঁসে ভিতরে ঢুকে বলরামকে বললো, "আয় বলরাম। তোর মামীকে পেন্নাম কর।"

বলরাম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মামী কলকন্ঠে হেসে বললো, "ওমা ভাগ্নে দেখি একেবারে গাঁইয়া ভূত। থাক বাবা থাক, আর পেন্নামে কাজ নেই।"

নটবর চৌকির উপর জাঁকিয়ে বসে খবরাখবর নিতে লাগলো। বলরাম আড়ষ্ট সন্ত্রস্ত মনে একপাশে বসে রইলো কোনমতে। তার মাথার মধ্যে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এই বউটি যদি তার মামী হয়, এই যে চারটি ছেলেমেয়ে যাদের মধ্যে তিনজন নটবরকে বাবা বাবা বলে ছেঁকে ধরেছে এবং চতুর্থ যে বাচ্চাটা নটবরের কোলে বসে পরম পরিতোষে তার কাঁধে গলায় নিজ মুখনিঃসৃত লালা মাখাচ্ছে এরা সবাই কে? আর এরা যদি নটবরের পরিবার হয় তবে দেশের বাড়িতে আধ ডজন আণ্ডাবাচ্চা সহ বলরামের যে মামী বিরাজ করছে সেই বা কার পরিবার? তক্ষুনি নটবরের উপদেশবাণী মনে পড়ে গেল তার - দেশ গাঁয়ের জগৎ আর এই শহর প্রবাসের জগৎ এ দুটো একেবারে আলাদা। তবে কি মামা তখন আভাসে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল তাকে?

আপাতত মামাবাড়িতেই আস্তানা গাড়তে হল বলরামকে। তবে এ ব্যবস্থা যে নেহাৎই অস্থায়ী সেটা প্রথম থেকেই আঁচ করতে পারলো বলরাম, নটবর সোজাসুজি না বললেও। বাড়িতে দুখানা কুঠরি হলেও বাসযোগ্য তার মধ্যে একটাই। অন্য ঘরখানা একাধারে রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর এবং গুদাম। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় দেয়ালগুলো কালোঝুল। ঘুঁটে কয়লা বাক্সপ্যাঁটরা গেরস্তের সারা মাসের কাঁচা আনাজ মশলাপাতি যাবতীয় স্টক করা সে ঘরে। তারই একপাশে সামান্য একফালি জায়গা করে নিয়ে ছ্যাঁকছোঁক করে রান্নাবান্নাও হচ্ছে কোনমতে।

বাকী ঘরখানাই থাকার ঘর। শোবার বসার নড়াচড়া করবার মত জায়গা শুধু এটুকুই। এরই মধ্যে স্বামী স্ত্রী আর চারটে বাচ্চা ছাড়া থাকে নটবরের এক অরক্ষণীয়া শালী। ত্রিভুবনে অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন নেই নাকি তার। এই সাতজনের উপর আবার অষ্টম বলরাম উদয় হয়েছে। মামা যতই খাতির যত্ন করুক এবং মামার খাতিরে মামী যতই

না মুখ বুঁজে থাকুক, এদের সংসারে বলরাম বেশীদিন থাকবে কোন মুখে এতগুলো প্রাণীর নিরন্তর অসুবিধের কারণ হয়ে? কাজেই চাকরিতে একটু স্থিতি হলেই বলরাম অন্যত্র সরে যাবে অনতিবিলম্বে।

নটবর ও বলরামের মালিক এক হলেও কাজ একত্রে নয়। যাদের দোকানে কাজ করে নটবর অধুনা তারা আর একটা নতুন দোকান দিয়েছে শহরের অন্য এলাকায়। দোকানপাট যাবতীয় সম্পত্তির মালিক যে আসল দোকানদার, বয়স ও অসুস্থতার জন্য ক্রমে ক্রমে দোকানের কাজপাট ছেলেদের হাতে তুলে দিচ্ছে ভাগজোগ করে। নটবরের মালিক ছিট কাপড়ের দোকানী আর বলরামের মালিক যার মনিহারীর দোকান তারা সহোদর ভাই। কাগজে-কলমে দোকানের মালিকানা হাতে পায়নি এখনও তবে দোকানপত্তর দেখাশোনার ভার পেয়েছে পুরোপুরি। বুড়ো মালিক আর তার ছেলেরা লোক হিসেবে মোটামুটি ভাল। নিয়মিত মাইনেপত্তর দেয়, মেহনতী লোককে নেকনজরে দেখে। নটবরের বেশ সুনাম আছে দোকানে যার জোরে সে ভাগ্নের জন্যে চাকরি জোটাতে পেরেছে এবং ভাগ্নেও যে সে সুনাম রাখতে পারবে সে বিশ্বাস তার আছে। তবে দুটো দোকান দুই এলাকায়।

নটবরের বাড়ি থেকে নটবরের কর্মস্থল কাছে হলেও বলরামের কর্মস্থল কাছে নয়। নটবর সাইকেলে দোকানে যায়। সে নিজের সাইকেল ভাগ্নেকে ব্যবহারের জন্যে দিতে রাজী কিন্তু বলরাম সাইকেল ব্যবহার করতে রাজী নয়। সাইকেলকে ভীষণ ডরায় সে। শহরের ভিড়ে-ভাড়ে সাইকেল চড়ে বেরোলে সে যে আর জ্যান্ত ফিরবে না এ তার অটল বিশ্বাস। আর এত কষ্ট করে সবকিছু ছেড়েছুড়ে পয়সা কামাতে এসে বেঘোরে নিজের প্রাণ দিতে কিছুতেই পারবে না বলরাম। বরং দু'আড়াই ক্রোশ হেঁটেই পাড়ি দেবে রোজ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটাও খুব একটা সহজ সমাধান নয়। আড়াই ক্রোশ পথ যেতে আসতে পাঁচ ক্রোশে দাঁড়ায় এবং গাঁয়ের খোলা-মেলা মাঠেঘাটের পাঁচ ক্রোশ আর শহরের জন-অরণ্য ঠেলে সাইকেল-রিক্সা-এক্কা-মোটর-বাস-ট্রাক বাঁচিয়ে অতখানি পথ চলা এক কথা নয়। বলরামের প্রাণান্ত পরিশ্রম হতে লাগলো। দোকানের কাজেও গাফিলতি হতে লাগলো প্রায়ই। তার আখেরটাই বরবাদ হয় বুঝি ! অতএব বলরামের বাসা পরিবর্তন একেবারে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু বাসা মানে তো আর কেবল মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, রাতে লম্বা হবার মত আশ্রয়টুকুই নয় শুধু। এই যে মামাবাড়ি সকালে উঠে মামার অরক্ষণীয়া শালী চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে, কাজে যাবার আগে গরম রুটি তরকারী বানিয়ে খেতে দিচ্ছে ভরপেট, বিকেলে কর্মক্লান্ত ঘর্মাক্ত দেহে ফিরে তৃষ্ণার পানীয় ক্ষুধার অন্ন রেডী পাচ্ছে হাতে হাতে, সে সব মামাবাড়ির আব্দার কোথা থেকে আসবে তার নিজস্ব বাসা বাড়িতে? দোকান থেকে? বলরাম যা মাইনে পায় তাতে বারোমাস দোকানের খাবার খাওয়ার ফুটানি চলে না। দু'দিনেই পকেট ফুটো হয়ে যাবে তার। তবে কি স্বপাক? কিন্তু বলরাম তো জীবনে কোনদিন হাতা খুন্তি ধরেনি। উনোন ধরাতেও জানে না সে, আটা মাখা রুটি সেঁকা তো দূরের কথা। তাদের দেশেগাঁয়ে এসব 'চুল্লা-চৌকি'র কাজ, রান্নাবান্না ঘর-গেরস্থালি মেয়েমানুষের কাজ। মরদ নিজের রুটি বানাবে, সে যে বড় লজ্জা বড় ঘেন্নার কথা।

মামা নটবর সস্নেহে পিঠে চাপড় মারে, "অত ভাবতে হবে না তোকে, আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। বাবুদের দোকানের লাগোয়া একখানা ঘর দেবে তোকে। ভাড়া লাগবে না। তুই ওখানে থাকলে দোকানের খবরদারিও করতে পারবি কিছু কিছু।"

"কিন্তু ও খাবে কি? যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ভাগ্নে তোমার!" শহুরে মামী মন্তব্য করলো।

মামা বলে, "কেন এখানে যেমন করে খাচ্ছে।"

মামী বিস্ময়ে ভ্রু-ভঙ্গি করে, "এখানে তো আমরা রান্নাবান্না করি। আমি আর আমার বোন লালি।"

নটবর আপোষের সুরে বলে, "বেশ তো। এখন থেকে এ বাড়িতে তুমি রান্না করবে আর বলরামের বাড়িতে রান্না করবে তোমার বোন লালি। কিগো লালি, তোমার আপত্তি নেই তো?"

লালি চা পরিবেশন করছিল। বলরামের চায়ের গ্লাস সশব্দে মাটিতে রেখে লজ্জায় লাল হয়ে সরে গেল।

নটবর বললো, "তবে সামনের রোববারেই শাদিটা ঝটপট সেরে

ফ্যাল। আজ সকালে পণ্ডিতজীর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা বলে রেখেছি। শহর বাজার, পয়সা ফেললে সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু রেডি পাবে। এ তো আর সেই গাঁয়ের ব্যাপার নয় যে একমাস আগে থেকে জোগাড় যন্তরে লাগতে হবে!"

বলরাম নিঃশব্দে চায়ের গেলাস তুলে নিলো। চায়ের জল ফুটিয়ে উনোনে আবার কয়লা দিয়েছে রাতের রান্নার জন্যে। ও ঘরটা ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। নিরুপায় লালি এ ঘরেই এক কোণে লজ্জানত কন্টকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কপালে আর ঠোঁটের একটু উপরে এখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে অপরিসর রান্নাঘরের গরমে পরিশ্রমে। লালি চকিতে একবার চোখ তুলতেই বলরামের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বলরামের মনে হল হাতে ধরা গেলাসটা থেকে একটা উষ্ণ সান্নিধ্য যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। গভীর অনুভূতির সঙ্গে গেলাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে চুমুক দিলো সে।